

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান ফ্রাইয়ের বাংলাদেশে সরকারি সফর শেষে বিবৃতি

ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে, আমি বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ৪ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সফরে এসেছি। এর সমাপ্তিতে আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি।

আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এটি আমার প্রথম কোনও দেশ সফর। আমি প্রথমেই বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছি, কারণ বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত মানবাধিকার কাউন্সিলে অসংখ্য প্রস্তাবের মূল পৃষ্ঠপোষক। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম গঠনে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুশীল সমাজের বেশ কয়েকটি সংগঠনও এই নির্দেশনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আমাকে মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (এর প্রস্তাব ৪৮/১৪-এর মাধ্যমে) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কীভাবে মানবাধিকারের পূর্ণ এবং কার্যকর অধিকার ভোগকে প্রভাবিত করে তা শনাক্ত ও এ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে।

বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানই একে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে একটি করে তুলেছে। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রধানত একটি নদী ব-দ্বীপ যেখানে নিচু ভূ-সংস্থান বিদ্যমান। এমনকি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সিলেট অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটারের বেশি নয় এবং এটি "হাওর" নামক জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এটি আরও গুরুতর খরা এবং ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়। আকস্মিক বন্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পানির পরিমাণ বাড়াচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঝড়ের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমি নোনা-পানিতে প্লাবিত হচ্ছে এবং লোকজনকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বাস্তুচ্যুত করছে। আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশ তার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি হারাতে পারে এবং এর ফলস্বরূপ ভূমি-ক্ষতি লাখ লাখ মানুষের জীবিকাকে প্রভাবিত করবে।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি তার প্রতিবেশি দেশগুলোতে। বাংলাদেশে প্রবাহিত ৫৪টি নদী ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে। তাই বন্যা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাগ্য প্রতিবেশীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। পানিপ্রবাহের ওপর বাধের অব্যাহত নির্মাণ-কাজ এবং উজানের দেশগুলোতে পানির নিগমন ববস্থাপনা এবং পানির ধরনের দুর্বল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে, যার ফলে খরা ও বন্যার একটি চক্র অব্যাহত রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই সমস্যাগুলোকে আরও বাড়াবে।

নিচু ভূমি সমুদ্রসৃষ্ট ঝড়ের ঝুঁকিতে থাকায় "চর" নামে পরিচিত উপকূলীয় দ্বীপগুলোতে বসবাসকারী ১ কোটি মানুষ অত্যন্ত অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী আরও ১০ লক্ষাধিক মানুষ রয়েছে যারা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং কৃষিজমিতে লবণ প্রবেশের মতো ক্ষতিকর প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে।

বিশ্বে বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে বাংলাদেশে। বজ্রপাতের কারণে প্রতি বছর ৩০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায়। সাক্ষাৎকার নেওয়া লোকেদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, এই বজ্রপাতের ঘটনা দিনদিন বাড়ছে ও পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে আরও তীব্র ঝড় সৃষ্টি হচ্ছে। এ বছরের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ওঠে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলে চলে যেতে বা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক লোক কর্মসংস্থানের সন্ধানে ঢাকায় আসে কারণ তাদের অঞ্চলে সে সুযোগগুলো সীমিত।

নারী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনার সময় প্রায়ই তারা বাড়িতে একা থাকে, বিশেষ করে নারীরা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে অপ্রত্যাশিত নানা চাপের সম্মুখীন হন।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি

বাংলাদেশ সরকার দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বেশ কিছু পরিকল্পনা ও আর্থিক দলিল তৈরি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ), ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (এনএপিএ), বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) ২০০৯, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (২০১৩) এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ডেল্টা প্ল্যান, পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স (পিপিআর), মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের অপেক্ষায়) এবং বাংলাদেশের জলবায়ুকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশল (এনএসএমডিসিআইআইডি)। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে চলেছে। বাংলাদেশ সরকার অনুমান করে যে, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হবে। দেশের জলবায়ু বাজেট রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় বাজেটের ৭ শতাংশের বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

অনেক পরিকল্পনা দলিল থাকা সত্ত্বেও, অনেক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সদস্যরা আমাকে বলেছে যে, প্রকৃত ফলাফলগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নয় এবং সেগুলো বাস্তবায়নযোগ্যও ছিল না। যখন আমি সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর একটি সমাবেশে এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, তখন জানতে পারি তাদের মধ্যে মাত্র একজনের সঙ্গে নতুন জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকারের টপ-ডাউন পরিকল্পনা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

সফরের মূল প্রতিপাদ্য

২০২২ সালের নভেম্বরে মিশরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের ২৭তম সম্মেলনে চারটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি:

- ক্ষয়ক্ষতি
- জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে স্থানচ্যুতি
- প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি
- অভিযোজন উদ্যোগ

এই মূল থিমগুলো ছাড়াও আমি প্রশমন সমস্যা (নিঃসরণ হ্রাস) সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মন্তব্য শুনেছি এবং এটিকে একটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলাদাভাবে বলব।

১. ক্ষয়ক্ষতি

ক্ষয়ক্ষতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যা একটি দেশের অভিযোজন ক্ষমতার বাইরে। এটা প্রতীয়মান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতি মূলত শিল্পোন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলোর দৃষ্ণের কারণে হয়। একটি আপাত বৈপরিত্য হলো এই যে, গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে যারা সবচেয়ে কম অবদান রাখে, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যমান তাদেরকেই মেটাতে হয়।

পরিদর্শনকালে আমি এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে সিলেট অঞ্চলে একটি আকস্মিক বন্যার পরবর্তী প্রভাবগুলো দেখেছি, যা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে বেশি দৃশ্যমান। আকস্মিক বন্যাটি জাতির ইতিহাসে নজিরবিহীন ছিল এবং বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার ৯৫ শতাংশই পানির নিচে ছিল।

আমি সুনামগঞ্জের কাছে একটি জনগোষ্ঠীর একদল নারীর সাথে দেখা করেছি, তারা জুন মাসের আকস্মিক বন্যার কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের অনেকের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। হাঁস, মুরগি এবং অন্যান্য গবাদি পশু ভেসে গিয়েছে এবং চিনাবাদাম ও ধানের ফসল নষ্ট হয়েছে। ফলস্বরূপ, তাদের জীবিকা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে এবং সেই সাথে তাদের জীবনযাত্রার মানও প্রভাব পড়ে, যা বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিইএসসিআর) ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পদসহ পরিচয়পত্রও হারিয়ে গেছে অনেকের। এই ক্ষতির কারণে তারা স্কুলের বই কিনতে বা ফি দিতে পারছে না, এবং শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না কারণ অধিকাংশ ভূমি পানির নিচে। এসব তাদের শিক্ষার অধিকারকে প্রভাবিত করছে (আইসিইএসসিআর-এর ধারা ১৩)। এই প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীর কাছে আকস্মিক বন্যা সম্পর্কে সামান্যই সতর্কতামূলক খবর ছিল এবং তাই তারা আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেনি। বন্যা থেকে বাঁচতে তাদের ঘরের ছাদে উঠতে হয়েছে।

তারা যে জমিতে বসবাস করছে তার জন্য খাজনা পরিশোধ করার চলমান চাপ বিদ্যমান ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে, এই জনগোষ্ঠীর তাদের ফসলের পর্যাপ্ত ফলন পেতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগবে। একই সময় লাগবে তারা যে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে। এই সময়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আরেকটি ঘটনা ঘটলে এই মানুষদের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

আকস্মিক বন্যার কারণে কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও সুনামগঞ্জের সেসব নারীকে দেখেছি বন্যার পানি যাতে ক্ষতি না করে তাই উঁচু মাঁচা তৈরি করে শাকসবজি চাষের পথ খুঁজতে। স্থানীয় সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো প্লাবিত জনগোষ্ঠীকে স্কুলের বই ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে সাহায্য করেছে। সুশীল সমাজের অনেক প্রতিনিধি বন্যার সময় এবং পরে স্বচ্ছসেবক হিসেবে বন্যা দুর্গত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই সহযোগিতার কাজ আজও অব্যাহত আছে।

আমি সাতক্ষীরা জেলার মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করেছি। তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে, বিশেষ করে ঝড়-বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকায় সামনের সারিতে রয়েছে। তাদের অনেকেই বাড়িঘর হারিয়েছে এবং ফসলি জমিতে নোনা জলের অনুপ্রবেশের শিকার হচ্ছে। আমি এই সম্প্রদায়ের নারীদের সাথে কথা বলেছি এবং তারা আমাকে তাদের সমস্যার খুব দুঃখজনক ব্যাখ্যা দিয়েছে। গবাদি পশু ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতির কারণে তারা নিকটবর্তী চিংড়ি ও কাঁকড়ার খামারে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। তারা দিনে ৬ ঘণ্টা লবণাক্ত পানিতে কাটাতে বাধ্য হয়। এটি তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারকে প্রভাবিত করেছে, যা আইসিইএসসিআর-এর ১২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য-অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ কেউ লবণাক্ত পানিতে কাজ করার সময় রক্তের প্রবাহ কমাতে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন বেছে নেয়। এর অনেকগুলো প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তাদের গর্ভপাতের প্রবণতা বেশি। এই সমস্যাগুলো পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কেউ কেউ আমাকে বলেছে যে, তাদের স্বামীরা তাদের ছেড়ে গেছে এবং আবার অন্যত্র বিয়ে করেছে। এর মানে হলো, নারীদেরকে তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পরিবারের প্রধান হিসেবে একটি বিশাল চাপ নিতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মুণ্ডা আদিবাসীরা অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বৈষম্য ও শোষণের সম্মুখীন হচ্ছে। কেউ কেউ তাদের ভূমিতে প্রবেশাধিকার হারিয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত বেশ কয়েকটি অধিকার, বিশেষ করে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, বাসস্থান এবং সেই সাথে স্বাস্থ্যের অধিকার এবং এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার অধিকার আদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

আমি যে স্থানগুলো পরিদর্শন করেছি তা সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ঘটে যাওয়া ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির একটি ছোট নমুনা মাত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ব্যয় ছাড়াও অনেক অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি রয়েছে, যা পরিমাপ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, আমি শুনেছি বন্যায় কবরস্থান তলিয়ে গেছে, ব্যক্তির নামাঘের আগে ওজু করার জন্য পরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে পারছে না, প্রাকৃতিক ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা উদ্ভিদও বিনষ্ট হয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) এবং প্যারিস চুক্তির পক্ষগুলোর সম্মেলন (সিওপি/কপ) দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোতে ক্ষয়ক্ষতি ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত। কপ ক্ষতি ও ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে একটি ওয়ারশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। প্যারিস চুক্তির ধারা ৮-এ বিশেষভাবে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ কোনও অর্থ প্রদান করা হয়নি। গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-এ, উন্নয়নশীল দেশগুলো একটি ক্ষতি এবং ক্ষতির আর্থিক সুবিধা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিল। অনেক উন্নত দেশ এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি উক্ত বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ অপরিষ্পন্ন এবং অবজ্ঞাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো বয়ে বেড়াতে পারে না, যা প্রধান দূষণকারীরা সৃষ্টি করেছে। সময় এসেছে এখন দূষণকারীদের অন্যান্য দেশের ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করা।

আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশের পাশে উজানে থাকা দেশগুলো আকস্মিক বন্যার বিষয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ নিয়ে তেমন চিন্তিত না বলে মনে হচ্ছে। এই দেশগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষমতা রাখে। ভারত ও চীন উভয় দেশের বৃহৎ জলবাহ ধর্ম এবং দুর্বল অববাহিকা ব্যবস্থাপনা অনুশীলন বাংলাদেশের জন্য উচ্চ খরচের কারণ হচ্ছে। এই দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতির প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ সরকার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনায় যথেষ্ট সক্রিয়। এটি দুর্বল দেশগুলোর গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটির সভাপতিত্ব করেছিল। ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক ওয়ারশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন।

দেশের জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় বাজেটের ৭ শতাংশের বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ২২ হাজার ৬৪০ ব্যারাক এবং ২ লাখ ৬০ হাজার বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬০৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। যদিও আশ্রয় কর্মসূচি কিছু পরিবারের জন্য সুরক্ষা প্রদান করেছে, এটি প্রত্যেকের জন্য আশ্রয় প্রদান করতে পারে না। আমি মুগা আদিবাসীদের কাছ থেকে শুনেছি, যারা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পেরেছিল তাদের সবার জন্য আগে থেকে সেগুলো বরাদ্দ ছিল। মুগাদের একটি ছোট এক কক্ষের স্কুলঘরে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিল, যা একটি ধর্মীয় বিশ্বাস-ভিত্তিক সংগঠন দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। যখন আমি মুগাদের সঙ্গে দেখা করি, আমি দেখতে পাই, আশ্রয়স্থলটি বিপদসীমার চিহ্ন থেকে ১ মিটারেরও কম উপরে।

এসব আশ্রয়কেন্দ্রের নকশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আমি সুনামগঞ্জের একটি স্কুল পরিদর্শন করেছি, যেটি বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরিবারগুলোকে নীচে বন্যার পানি নিয়ে ১৯ দিন ডেকের উপর ঘুমাতে হয়েছিল। পায়খানাগুলো প্লাবিত হওয়ার কারণে স্যানিটারি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। পাঠদান স্থগিত করতে হয়েছিল। এই অঞ্চলের অনেক স্কুল বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, পায়খানাগুলো বন্যার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়নি। সিলেটে আমি যে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিলাম, তারা একটি আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারেনি কারণ বন্যার পানি তাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

২. জলবায়ু পরিবর্তন স্থানচ্যুতি

অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে দুর্ঘোণের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৪৪ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্রের ফলে ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কারও জন্য এই স্থানচ্যুতি সাময়িক, আবার কারও জন্য এটি স্থায়ী। কারণ তাদের জীবিকা রক্ষা করা যায়নি। আমি শুনেছি কিছু লোক সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে।

সিলেট ও খুলনা দুটি অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং অবহিত হই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব কিছু পরিবারের জন্য খুব বেশি হয়েছে এবং আয়ের অন্যান্য উত্স খুঁজতে তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরাই চাকরি খোঁজার জন্য দূরে চলে গেছে। এটি সেইসব পরিবারের নারীদের জন্য একটি চাপ তৈরি করেছে, যার ফলে সমস্যার বেড়াজাল তৈরি হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি আনতে নারীদের ৬ কিমি পর্যন্ত হাঁটতে হয় এমন গল্পও শুনেছি। এই সময়ের জন্য তাদের অনুপস্থিতির অর্থ হল কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজগুলোকে কমাতে হয়েছিল, যার ফলে একটি বাড়তি অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছিল। শুনেছি, নারীরা তাদের বাচ্চাদের ফেলে রেখে পানি আনতে যেতো যা বাচ্চাদের বিপদে ফেলে। একজন নারী ফিরে এসে দেখেন যে, তার অনুপস্থিতিতে শিশুটি পানিতে ডুবে গেছে। দুর্ঘটনাবশত আঙুনে দক্ষ হয়েছে আরেক শিশু। পানি খোঁজার জন্য দীর্ঘ পথ হাঁটার দরুণ নারীরা প্রায়শই পুরুষদের দ্বারা হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

আমি যুব সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করেছি। তারা বলেছে, সিলেটের হাওর অঞ্চলে বন্যার পরে তাদের কয়েকজন সহকর্মী আয় না থাকায় শহর ও বস্তি এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য আরও সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে না হয়।

আমি অনেক লোককে রাস্তায় একেবারে মৌলিক আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করতে দেখেছি। ঢাকায় ৫ হাজারের বেশি বস্তি রয়েছে, যেখানে আনুমানিক ৪০ লাখ মানুষ বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এর মধ্যে অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এসব অনানুষ্ঠানিক বসতিতে অনেকেই অসুস্থতায় ভুগছে। তাদের বক্তব্য থেকে আমি জানতে পারি, বসতিগুলোতে বসবাসকারী নারীদের গোসলের জন্য গোপনীয়তার অভাব মোকাবিলা করতে হয়, টয়লেটের জন্য দীর্ঘ সারিতে দাঁড়াতে হয় এবং যৌন হয়রানির শিকারও হতে হয়। শহরে বস্তিতে শিশুদের অবস্থা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় অনেক বেশি খারাপ। অপুষ্টির উচ্চ হার, স্কুল থেকে ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম এবং নির্যাতন শহরে বস্তিগুলোতে বেশি। এই অবৈধ বসতিগুলোতে বসবাসকারী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির (আইডিপি) উচ্চ ভাড়া, উচ্ছেদের ভয়, পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাব, অপুষ্টি, নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের অভাবে ভোগে। পানির বেশিরভাগই লবণাক্ত, যা নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে। আমি শুনেছি যে, বস্তিতে মানব পাচার একটি সাধারণ ঘটনা।

৩. প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

সফরকালে আমি সুশীল সমাজের বেশ কিছু সংগঠনের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন যুব গোষ্ঠীর কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। তারা বাংলাদেশের জনগণ যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছে। আমি সুনামগঞ্জে যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করেছি এবং তারা স্কুলে পরিবেশবান্ধব ক্লাবের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। সিলেট জেলায় আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধার ও জরুরি ত্রাণ প্রদানে স্বৈচ্ছাসেবক হিসেবেও তারা সক্রিয় ছিল।

আমি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাজ করে এমন মানবাধিকার কর্মীদের কাছ থেকে দাবির একটি বিবৃতি পেয়েছি যে, তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে হয়রানি এবং কারাবাসের শিকার হয়েছে। দাবি করা হয় যে, জনসাধারণের মন্তব্যের জন্য "স্থানীয় স্থান সংকুচিত" ছিল। আমাকে বেশ কয়েকটি ঘটনা জানানো হয়েছে। জেনেছি কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকার কর্মীরা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেফতার বা হয়রানির শিকার হয়েছে। আমি "অজানা" ব্যক্তি দ্বারা পরিবেশ বিষয়ক মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হুমকির ঘটনাও শুনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইতিবাচক অবস্থান তৈরির চেষ্টা করা একটি জাতির জন্য সম্ভবত সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এ ধরনের ভয়ভীতি প্রদান ভালো নয়।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনমতকে দমন করতে ডিজিটাল সুরক্ষা আইন ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এই দমন মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে এই আইন ব্যবহার করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো উন্নয়নের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ কখনই সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার মধ্যে আসা উচিত নয়। জনসাধারণকে হয়রানি বা কারাবাসের ভয় ছাড়াই সরাসরি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিত। দরিদ্র বিপর্যস্ত যুবকেরা, যাদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য কিছু নেই, তারা চরমপন্থী সংগঠনের শিকার হতে পারে, কিন্তু তারা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকারের বিপক্ষে নয়।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা হয়েছে এমন দাবি সরকারের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে।

আমি প্রাক্তন মানবাধিকার কমিশনার মিশেল ব্যাচলেট বাংলাদেশ সফরের পর যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা জোর দিয়ে বলতে চাই। তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন, বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেন। আগামী নির্বাচনের আগে সুশীল সমাজকে কণ্ঠ তোলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছি। এই ধরনের বাকস্বাধীনতা দমন কেবল অসন্তুষ্টি জন্ম দিবে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া।

বিশেষ করে তরুণদের তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে দিতে হবে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশ তরুণ-তরুণী। আমি সিলেটের হাওর অঞ্চলের তরুণদের সাথে কথা বলেছি এবং তারা আক্ষেপ করেছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বলার কিছু নেই। তরুণদের কথা-বলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও কিছু করতে হবে। আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের একটি দুঃখজনক উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি, এবং আমাদের অবশ্যই তরুণদের তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার অনুমতি দিতে হবে।

আমি অনেক নারী দলের সাথে কথা বলেছি এবং **লিঙ্গবৈষম্যের অভাবের** বিষয়টি একটি নিয়মিত বার্তা হিসেবে পেয়েছি। অনেক নারী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাপ বহন করে। লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আরও রক্ষণশীল ধর্মীয় স্বার্থের ধাক্কা কিছু জায়গায় লিঙ্গ সমতাকে বিপরীতমুখী করে তুলেছে বলে মনে হচ্ছে। এই নারীদের চাহিদার প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। তাদের উদ্বেগ পরিবার, সম্প্রদায়, আঞ্চলিক, জাতীয় স্তর এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুনতে হবে এবং তাদের উদ্বেগ পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা দমন করা উচিত নয়। আরও বেশি নারী ও যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক আলোচনায় কথা বলতে দিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের সংশোধন একটি ভাল সূচনা, তবে যে কোনও সংশোধন অবশ্যই তৃণমূল থেকে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নারীদের সাথে আলোচনার জন্য সরকারকে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা অন্তঃসারশূন্য হওয়া উচিত নয়।

তাদের বক্তব্য থেকে আমি জেনেছি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের কথা বলার অধিকার কম। এটা পরিষ্কার যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের শিকার হচ্ছে এই সব আদিবাসী জনগণও। এসব প্রভাবের কোনও কোনওটি কেবল তাদের প্রেক্ষাপটে অনন্য। পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীরা অতিবৃষ্টিতে ভূমিধসের কবলে পড়ছে আবার খরার কারণে বিশুদ্ধ পানির সংকটেও পড়ছে। যারা উপকূলে বাস করছে, তারা উদ্ভিদের পুষ্পায়নের ক্ষেত্রে মৌসুমী পরিবর্তনের মতো বিশেষ ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সম্মুখীন হয়, যার ফলে তাদের খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য প্রভাবিত হয়। সরকার এই আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক বলে মনে হয়, তাদের জাতিগত সংখ্যালঘু বা এই জাতীয় অন্যান্য নামে আখ্যা দিতে পছন্দ করে।

৪. অভিযোজন কর্ম

সরকার ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সমাধান খোঁজার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। যাই হোক, চ্যালেঞ্জগুলো বিশাল এবং আরও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। অভিযোজন ক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সন্ধান করা স্পষ্টতই সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে একটি। আমি বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার কাছ থেকে শুনেছি, অভিযোজনের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থের গুরুতর অভাব ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ অভিযোজনের চেয়ে প্রশমন (নিঃসরণ হ্রাস) কর্মের প্রতি প্রবলভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয়। সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) প্রশমন ও অভিযোজনের মধ্যে অর্থায়নে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বিভাজন প্রদান করবে এমন একটি চুক্তি সত্ত্বেও, এটি হয়নি। প্রশমন প্রকল্পের জন্য তহবিল গঠন করা অভিযোজনের জন্য অর্থ জোগাড়ের চেয়ে অনেক বেশি দরকারি। উপরন্তু, আমি এমন মন্তব্য পেয়েছি যে, জিসিএফ-এর মাধ্যমে অভিযোজনের জন্য অর্থ পেতে দীর্ঘ অনুমোদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, যা প্রশমন অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

সরকার বেশ কিছু অভিযোজন কার্যক্রম শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারের উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (সিইআইপি) ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার কিছু প্রভাব থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই বাঁধগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্প্রদায়ের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আমি লক্ষ্য করেছি, সেখানে কিছু বাঁধ ভেঙ্গে নোনা জল ধানক্ষেতে প্রবেশ করেছে। সরকার নোনা জলের অনুপ্রবেশের শিকার সম্প্রদায়গুলোকে সাহায্য করার জন্য মোবাইল ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট সরবরাহ করেছে। নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলো সম্প্রদায়গুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করেছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, রাস্তার ধারে গাছ লাগানো, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য ধান কাটার মালচিং, চারা তৈরি করা এবং শাকসবজি চাষের জন্য বস্তা ব্যবহার করে বাগান করা। এগুলো কেবলমাত্র কয়েকটি উদ্ভাবনী ধারণা যার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সুশীল সমাজের কিছু সংস্থা মুণ্ডা জনগণকে জমির মালিকানা পেতে সাহায্য করেছে, যাতে তারা এই একটি বৃহত্তর সুযোগের পরিকল্পনা এবং তাদের ভাগ্য বদলাতে পারে।

৫. প্রশমন কর্মকাণ্ড

বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা দাবি করেন যে, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ০.৫৬ শতাংশ। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে একটি।

নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান' দলিলে ধারণা করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সহায়তার জন্য বাহ্যিক অর্থায়নের উপর নির্ভর করা। এটি বোধগম্য যে, একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকায় দেশটিকে নিঃসরণ কমাতে আরও বেশি কিছু করতে হবে। কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা ইতোমধ্যেই একটি অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করেছে। কারণ এটিকে অবশ্যই বাহ্যিক সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশের মতো একটি বিকাশমান অর্থনীতিতে জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার স্বীকৃতি সত্ত্বেও এটা উল্লেখযোগ্য যে, নতুন কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলোকে নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশের নিজের বহন করা উচিত না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত অতি অনুকূল শর্তে যথোপযুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি দেওয়া, যাতে বাংলাদেশের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী ভবিষ্যত নিশ্চিত হয়।

সরকারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সুশীল সমাজের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠি। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভগুলো সরকারের কাছ থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত অদক্ষ এবং ব্যক্তিগত যানবাহন থেকে অস্বাভাবিকভাবে উচ্চমাত্রায় নিঃসরণ হয়। একটি ব-দ্বীপের উপর ভিত্তি করা দেশের ভৌত বৈশিষ্ট্যের কারণে, রাস্তাগুলো, বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহরের সড়কগুলো, প্রায়শই সংকীর্ণ হয়, যার ফলে দীর্ঘ যানজট এবং উচ্চ নিঃসরণ হয়। দেশটিতে বৃহত্তর ট্রাফিক চলাচলের পরিকল্পনা প্রয়োজন, যার মধ্যে থাকবে গণপরিবহনের জন্য নির্ধারিত লেন বা রাস্তা এবং অল্প কার্বন নিঃসরণকারী যানবাহন। নতুন ওভারপাস রাস্তা এবং গণরেল পরিবহন সম্ভবত এই পরিস্থিতি উপশম করবে না।

নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর জন্য অনুকূল শর্তে প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে। এটি নাটকীয়ভাবে নিঃসরণ এবং বায়ুদূষণ সমস্যা হ্রাস করবে।

ইউএন-আরইডিডি প্রোগ্রাম বাংলাদেশকে তার জাতীয় আরইডিডি+ কৌশলপত্র প্রণয়নে সহায়তা করেছে, যাতে বন উজাড় এবং ক্ষয়ের কারণ সনাক্ত করা হয়েছে। যাই হোক, আমি শুনেছি এই কর্মসূচিটি হেঁচট খেয়েছে। উদ্বেগজনক হারে বন উজাড় অব্যাহত রয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছিল যে, গাছ কাটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকগুলোর পরিচালনা করেন খুব প্রভাবশালী সরকারি কর্মকর্তারা। এই বন উজাড়ের পরিণতি পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধস বাড়িয়ে তুলছে। এটি বিশ্বব্যাপী নিঃসরণেও অবদান রাখছে। আমি যে আদিবাসীদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছে যে, জাতীয় আরইডিডি+ কৌশলপত্র প্রণয়নের বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করা হয়নি, কিংবা তারা জমিতে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য সম্মতি দেয়নি। গাছ কাটা এবং জলবায়ু পরিবর্তন পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মানবাধিকারের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় পানির সরবরাহ শুকিয়ে গেছে, যার অর্থ হলো মিঠাপানি খোঁজার জন্য নারীদের নিম্নভূমিতে দিনে ৬ ঘন্টার বেশি হাঁটতে হয়। আদিবাসীরা খাদ্য ও ওষুধের জন্য যে গাছপালা ও প্রাণীর উপর নির্ভর করে তার অনেকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরো জীবনধারা ব্যাহত হচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছিল যে, বিরূপ পরিস্থিতির কারণে সেখানে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে।

উপসংহার এবং সুপারিশ:

এটা খুবই দৃশ্যমান যে, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষ করে মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলোর আধিক্যের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি স্বীকৃতি দিতে চাই যে, বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ পুনরুদ্ধার এবং অভিযোজন কৌশল প্রণয়নের জন্য নিজস্ব অর্থায়নের যথেষ্ট পরিমাণ ব্যয় করেছে। এসব কাজের জন্য দেশটিকে প্রশংসা করা উচিত। দেশটি বিপুল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। আমার সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো পেশ করছি:

১. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই বছর একটি ক্ষয়ক্ষতির তহবিল গঠনের বিষয়ে একমত হতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জিডিপিতে সৃষ্ট বিশাল ব্যয় বহন করতে পারে না।

২. আঞ্চলিক নদী অববাহিকার দেশগুলোকে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে এবং একটি ন্যায্য ও ন্যাযসঙ্গত আঞ্চলিক নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশ সরকারকে তার জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে পরামর্শ করতে হবে। এই ধরনের পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা আছে এমন সমাধানের জন্য প্রদান করা উচিত। নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তবায়িত মানুষের সংখ্যাকে কীভাবে কমানো করা যায়, সে বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি সুস্পষ্ট নীতিকৌশল প্রণয়ন করা দরকার। বস্তিতে বসবাসকারী মানুষদের আরও ভালো সেবা দিতে হবে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকার কর্মী এবং আদিবাসীদের বিরুদ্ধে হয়রানি, হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শনের অবসান ঘটাতে হবে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানির জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগ সরকার অস্বীকার করেছে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা দরকার, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মানবাধিকার কর্মী এবং আদিবাসীরা সন্ত্রাসীদের বিস্তৃত সংজ্ঞায় না পড়ে। এসব মানুষ সন্ত্রাসী নয়।

৬. বাংলাদেশ সরকারের উচিত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে আদিবাসীদের মানবাধিকারের ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব সংক্রান্ত বিশেষ প্রেক্ষাপটকে আরও বিবেচনায় নেওয়া। আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার প্রতি সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে এসব আদিবাসীদের প্রতি সুবিবেচনা আরও বাড়ানো যায়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারকে একটি সুস্পষ্ট কৌশল তৈরি করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কেবল দেশের ওপর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে উদ্বিগ্ন দেশের খ্যাতি হারাতে পারে। যারা আমার সাথে দেখা করে সময় দিয়েছেন এবং সমৃদ্ধ তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণকে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি উৎসাহিত যে, আমার সহকর্মী মানবপাচার, বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার, সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি সিওভান মুল্লালি ৩১ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবেন। তিনি যে বিষয়গুলো দেখবেন তার মধ্যে একটি হলো মানবপাচারের ঝুঁকির ওপর জলবায়ুর প্রভাব। আমার সঙ্গে যেসব অংশীজনের দেখা হয়েছে, আমি তাদের উষ্ণভাবে অনুরোধ করছি তার মিশনে একই সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্য।

আমার অবশ্যই জোর দিতে হবে যে, এই বিবৃতিতে শুধুমাত্র আমার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ রয়েছে এবং আমার অনুসন্ধানের একটি ব্যাপক সারসংক্ষেপের ওপর আলোকপাত না করে কেবল মূল বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেছে। আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ২০২৩ সালের জুনের অধিবেশনে আমার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেব এবং ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকব।

বিশেষ প্রতিনিধি সম্পর্কে তথ্য

মি. ইয়ান ফ্রাই হলেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার প্রথম বিশেষ প্রতিনিধি। ২০২২ সালের মার্চ মাসে মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪৯তম অধিবেশনে তাকে নিযুক্ত করা হয় এবং ২০২২ সালের ১ মে তার দায়িত্ব শুরু হয়। মি. ফ্রাই একজন আন্তর্জাতিক পরিবেশআইন এবং নীতি বিশেষজ্ঞ। তার কাজের প্রধান দিকগুলো হলো প্রশমন নীতি এবং প্যারিস চুক্তি, কিয়োটো প্রোটোকল এবং সংশ্লিষ্ট দলিলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি। তিনি ২১ বছরেরও বেশি সময় ধরে টুভালু সরকারের হয়ে কাজ করেছেন এবং ২০১৫-২০১৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য তাদের দূত হিসেবে নিযুক্ত হন।

বিশেষ প্রতিনিধিগণ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ কার্যপ্রণালী হিসেবে পরিচিত তার অংশ। জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের বৃহত্তম সংস্থা এই বিশেষ কার্যপ্রণালী, কাউন্সিলের স্বাধীন তথ্য-অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সাধারণ নাম, যা বিশ্বের সকল অংশে নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি বা বিষয়গত সমস্যাগুলোর সমাধান করে। বিশেষ কার্যপ্রণালীর বিশেষজ্ঞরা স্বেচ্ছায় কাজ করেন; তারা জাতিসংঘের কর্মী নন এবং তাদের কাজের জন্য বেতন পান না। তারা যে কোনও সরকার বা সংস্থা থেকে স্বাধীন এবং তাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতায় কাজ করেন।

সফর সম্পর্কে তথ্য

সফরকালে আমি পররাষ্ট্র সচিব, পরিবেশ সচিব, দুর্যোগ সচিব এবং কৃষি সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি সিলেট জেলা কমিশন, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক এবং স্থানীয় ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। আমি জাতিসংঘের প্রতিনিধি, নারী ও যুব গোষ্ঠীসহ সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার সাথেও দেখা করেছি। আমি সিলেট অঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত একটি স্কুল পরিদর্শন করেছি এবং স্কুলের শিশুদের যত্ন নেওয়া ব্যক্তি এবং শিশুগের সঙ্গে কথা বলেছি। এছাড়াও সুনামগঞ্জে আকস্মিক বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি সম্প্রদায়ের নারীদের সাথে কথা বলেছি। আমি পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় মুণ্ডা আদিবাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের বেশ কিছু আদিবাসীদের সাথে অনলাইনে কথা বলেছি।